ভাষাজ্ঞান

বাংলা বানানরীতি, বাক্যের ব্যবহারবিধি ও উচ্চারণের সাত-পাঁচ

ভূমিকা

বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। জন্মের পর থেকে এ ভাষার সাথেই আমাদের বসবাস। আমাদের মরণ পর্যন্ত এ ভাষাই আমাদের বলা ও লেখার সহজতর মাধ্যম। সুতরাং ভাষাটাকে শুদ্ধতার সাথে ব্যবহার করা ও নির্ভুল বানানে লেখা সকলেরই কর্তব্য। নিজের ভাষা বলে যথেচ্ছা ব্যবহার করব–এটা হতে পারে না। এর বিপরীতে আমরা যখন অন্যদের ভাষা ইংরেজি/আরবি/উর্দু শিখি, পড়ি ও লিখি, তখন কি আমরা ভুল বানানে, অশুদ্ধ উচ্চারণে, ব্যাকরণের নীতি ডিঙিয়ে ব্যবহার করি? করি না। সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সামনে বাড়ি। অন্য ভাষার প্রতি আমাদের এতটা দরদ হলে নিজের ভাষার প্রতি আরও ব্যাপক দরদ হওয়ার কথা। আজকের বাস্তবতা হলো, আমরা নিজেদের ভাষার প্রতি কোনো দরদ পোষণ করি না, আগ্রহও রাখি না; ফলে আমাদের ভাষা আমাদের কাছেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, কঠিন ও দুর্বোধ্য।

এ ছাড়াও আমাদের ভাষার রয়েছে গর্ব করার মতো একটি হিরণ্ময় স্মারক, যা অন্য ভাষাভাষী কারও নেই। পৃথিবীজুড়ে এ দৃষ্টান্ত তুলনাহীন। একটা দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আমাদের স্থায়ী ভাষা হয়েছে। সুতরাং সেই রক্তের দাবিও এটাই, বাংলা ভাষা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদাসমেত বেঁচে থাকবে। সর্বক্ষেত্রে বাংলা হবে আমাদের বলা-কওয়া, লেখা ও প্রকাশের সুন্দর নির্ভুল স্বচ্ছ মাধ্যম। অনেকে বাংলা ভাষাকে কঠিন বলে; হীনতা প্রকাশ করে, দুরূহতার অভিযোগ করে। আফসোস, আপনি নিজের ভাষাটাকে দুরূহ বললেন। অথচ এই ভাষা ছাড়া আপনি মনের ভাব মনের মতো করে ব্যক্ত করতে পারেন না, আর সেই ভাষাকেই বললেন কঠিন? কঠিন বলে ভাষার প্রতি আপনি যে অভিযোগ করেছেন, আমি বলব, সেই কঠিন ও দুরূহতাই আমার ভাষার সৌন্দর্য, সৌকর্য ও মুগ্ধতা। আসলে কি জানেন, অন্য ভাষাকে যতটা সময় দিই, বাংলা ভাষা শেখায় ততটা দিই না, এর অর্ধেক সময়ও দিই না। আর না শিখলে তো কঠিন মনে হবেই। আমাদের সেই দুরূহতা দূর করবে এই বই–ইনশাআল্লাহ।

–হাবীবুল্লাহ সিরাজ

নরসিংদী

সূচীপত্র

অক্ষর ও যুক্তাক্ষর পরিচিতি ও গঠন ____ ০৮
'মাত্রা' কাকে বলে ____ ০৯
বাংলা শব্দের প্রকারভেদ ____ ১০
যুক্তবর্ণ পরিচিতি ____ ১৩
যুক্তবর্ণে স্বচ্ছরূপ ও অস্বচ্ছরূপ ____ ২৬
হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কারের গল্প ____ ৩২
হ্রস্ব উ-কার ও দীর্ঘ ঊ-কারের গল্প ____ ৪১
দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ-এর বিধান ____ ৪৪
মূর্ধন্য ষ-এর বিধান ____ ৪৭
খণ্ড-ত-য়ের আস্ত কথা ____ ৫৯
প্রতিবর্ণের নানারূপ ____ ৮০
ক্রিয়াপদের রকমফের ____ ৯০
যতি-চিহ্ন বা বিরাম-চিহ্ন ____ ১১০
অ-কারের উচ্চারণ বিধান ____ ১১৬
সমার্থক শব্দের অভিধান ____ ১২২
সমোচ্চারিত শব্দের অভিধান ____ ১২৪
অশুদ্ধ শব্দের অভিধান ____ ১২৭

অক্ষর ও যুক্তাক্ষর পরিচিতি ও গঠন

আমাদের বাংলা ভাষার বর্ণমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত একাকী উচ্চারিত হয় তাকেই স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ **১১**টি। যথা–

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ হচ্ছে এমন কিছু বর্ণ, যারা অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় এ ধরনের কিছু বর্ণ রয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা মোট **৩৯**টি। যথা–

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব[১]
শ ষ স হ
ড় ঢ় য়
ৎ ং ঃ ঁ

খণ্ড অক্ষর পরিচিতি

ৎ খণ্ড ৎ 'ত'-এর খণ্ডিত রূপ।

ং অনুস্বার 'ঙ'-এর খণ্ডিত রূপ। উচ্চারণ হবে 'ঙ'-এর মতো।

ঃ বিসর্গ 'ই'-এর আরেকটি রূপ, 'র' এবং 'দন্ত্য-স' বিলুপ্ত হয়ে বানানে বিসর্গ আসতে পারে। যেমন : পুনর>পুনঃ, নমস>নমঃ। মধ্যবর্তী বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে দেয়।

ঁ চন্দ্রবিন্দু স্বরের নাসিক্যবোধক চিহ্ন

ব-য়ের কারামতি

বাংলা বর্ণমালায় **'ব'** দুটি–জানেন? এখন জেনে নিন। একটি হলো প-বর্গের সারিতে প ফ **ব** ভ ম; অন্যটি হলো য-বর্গের সারিতে য র ল **ব**। আজকাল

১ বর্তমানে অক্ষর বিন্যাসে অন্তঃস্থ ব- কে পৃথক করে সাজানো হয় না।

দ্বিতীয় ব-কে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম ব-কে বর্গীয় ব দ্বিতীয় ব-কে অন্তঃস্থ ব বলে। দ্বিতীয় ব সাধারণত একাকী ব্যবহার হয় না, বরং সে ব-ফলা হিসেবে আসে। ব-ফলা হিসেবে ব্যবহার হলেও সেখানে উচ্চারণে আসে না। যেমন : বিদ্বান, দ্বিতীয়, ধ্বনি, তন্বী, বিশ্ব। শব্দগুলোতে লক্ষ করুন, এগুলোতে ব-য়ের কোনো উচ্চারণ নেই; বরং যে বর্ণের সাথে ফলা আকারে যুক্ত হয়েছে সেগুলোর উচ্চারণকে দ্বিত্ব করে দিচ্ছে। এটিই অন্তঃস্থ ব-য়ের কারসাজি। আর বর্গীয় ব সব সময় উচ্চারণ হয়। উদ্বেল, বুদ্বুদ, কদম্ব, দিগ্বিজয়–এই শব্দগুলোর প্রতিটিতে ব-য়ের স্বতন্ত্র উচ্চারণ আছে। বুঝে নিতে হবে এগুলো বর্গীয় ব।

'মাত্রা' কাকে বলে

'এ ও ত্র' দেখতে প্রায় কাছাকাছি লাগে। অনুরূপ 'ও ও ত্ত' বর্ণ দুটিও দেখতে প্রায় কাছাকাছিই লাগে। আসলে কি কাছাকাছি লাগলেই কাছাকাছি হওয়া যায়? 'এ ও ত্র' এবং 'ও ও ত্ত' বর্ণগুলোর মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। 'এ' স্বরবর্ণ 'ত্র' যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ। 'ও' স্বরবর্ণ 'ত্ত' যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ।

এই পার্থক্য আমরা কীভাবে বুঝব? এটি বুঝতে হলে আগে আমাদের 'মাত্রা' বুঝতে হবে। বাংলা বর্ণমালার মাথার ওপর যে দাগ বা টান আছে, সেগুলোকে 'মাত্রা' বলে। মাত্রার বিবেচনায় বাংলা বর্ণমালাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। **ক.** মাত্রাবিহীন বর্ণ, **খ.** অর্ধমাত্রিক ও **গ.** পূর্ণমাত্রিক।

মাত্রাবিহীন বর্ণ ১০টি। যথা–
এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, এবং ঁ।
অর্ধমাত্রিক বর্ণ ৮টি। যথা : ঋ, খ, গ, ণ, থ, ধ, প এবং শ।
পূর্ণমাত্রিক বর্ণ ৩২টি। যথা : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ় এবং য়।

বাংলা শব্দের প্রকারভেদ

বানানসংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে শব্দের প্রকার-প্রকরণ নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। ভাষার প্রকরণগুলো বানানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকার ভিন্নতার কারণে বানানে ভিন্নতা আসে। যেমন : কুৎসিত/কুচ্ছিত; প্রথমটি তৎসম শব্দ, দ্বিতীয়টি অর্ধ-তৎসম শব্দ। প্রকার ব্যবধানে বানান ও উচ্চারণে কেমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুতরাং প্রকার-জ্ঞান অনেকটাই জরুরি বানান শেখার জন্য।

বাংলা ভাষার বয়স প্রায় হাজার বছর। এই হাজার বছরে বাংলা বিভিন্ন উৎস থেকে অগণিত শব্দ গ্রহণ করেছে। উৎসের দিক বিবেচনায় বাংলা ভাষার শব্দকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : ০১. তৎসম, ০২. অর্ধ-তৎসম, ০৩. তদ্ভব, ০৪. দেশি শব্দ, ০৫. বিদেশি[২] শব্দ ও ০৬. মিশ্র শব্দ।

০১. তৎসম[৩] শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলায় চলে এসেছে; সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, শাসনব্যবস্থা, সাহিত্য, দর্শন প্রায় সকল স্থানে সংস্কৃত ভাষার দাপট ছিল। এ কারণে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রচুর পরিমাণে শব্দ গ্রহণ করেছে। বলা হয়, বাংলার শব্দসংখ্যা এক কোটি পঁচিশ হাজার। তার মধ্যে তৎসম শব্দই প্রায় পঞ্চাশ হাজারের ওপরে।

একগুচ্ছ তৎসম শব্দ : অগ্রহায়ণ, অন্ন, অল্প, অদ্য, কল্য, কর্ম, গৃহ, জল, জয়, চরণ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, পুরুষ, পণ্ডিত, পুষ্প, পত্র, পর্বত, প্রত্যাশা, পরীক্ষা, মনুষ্য, মস্তক, মূর্খ, মুক্তি, তৃণ, বহু, বৃক্ষ, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভাষা, সূর্য ইত্যাদি।

০২. অর্ধ-তৎসম : সংস্কৃত থেকে আগত যেসব শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলো অর্ধ-তৎসম শব্দ। এই শব্দগুলো মানুষের মুখে মুখেই পালটেছে। যেমন–

তৎসম	অর্ধ-তৎসম		তৎসম	অর্ধ-তৎসম
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান		কুৎসিত	কুচ্ছিত
জ্যোৎস্না	জোছনা		শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ

২. 'বিদেশী' দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে পুরাতন বানান। আধুনিক বানান হ্রস্ব ই-কার দিয়ে 'বিদেশি'।

৩. এভাবেও বোঝা যায়, তৎ মানে তার, সম মানে সমান। অর্থ দাঁড়াল–তার সমান। অর্থাৎ, সংস্কৃত ভাষার সমান। তৎসমই সংস্কৃত, সংস্কৃত মানেই তৎসম।

গৃহিণী	গিন্নী		বৈষ্ণব	বোষ্টম
ক্ষুধা	ক্ষিধে		গাত্র	গতর
গ্রাম	গেরাম		ঘৃণা	ঘেন্না
চন্দ্র	চন্দর		যত্ন	যতন
তৃষ্ণা	তেষ্টা		প্রণাম	পেন্নাম

০৩. তদ্ভব শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তন হয়ে প্রাকৃত হয়েছে, অতঃপর অপভ্রংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, এরও পরে আরও পরিবর্তন হয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে; সেগুলোকেই বলা হয় তদ্ভব শব্দ। যেমন–

সংস্কৃত>	প্রাকৃত>	তদ্ভব		সংস্কৃত>	প্রাকৃত>	তদ্ভব
অগ্র	অগগ	আগ		অদ্য	অজ্জ	আজ
অগ্নী	অগনি	আগুন		অর্ধ	অদ্ধ	আধ
অভ্যন্তর	ভীতর	ভিতর		অঙ্ক	টঙ্কা	টাকা
কর্ম	কজ্জ	কাজ		খাদ্য	খাচ্ছ	খাবার
গৃহ	গর্হ	ঘর		গাত্র	গাঅ	গা
ঘটিকা	ঘড়িআ	ঘড়ি		চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
চর্মকার	চম্মআর	চামার		দধি	দহি	দই
তৈল	তেল্ল	তেল		দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ
পাদ	পাতা	পা		বধূ	বহু	বৌ/বউ
বক্ষ	বুকখ	বুক		ভ্রান্ত	ভুল্ল	ভুল

০৪. দেশি শব্দ : আর্যদের আগমনের পূর্বে যারা এ ভূখণ্ডে বসবাস করত, তাদেরকে বলা হয় অনার্য। সেই অনার্যরা যে ভাষা ব্যবহার করত, সেই ভাষা বাংলা ভাষায় বহু প্রবেশ করেছে এবং আদিকাল থেকেই বাংলায় ব্যবহার হয়ে আসছে। সেগুলোকেই বলা হয় দেশি শব্দ। চাউল, ডাব, চুলা, ঢেকি, টোপর, পেট, কুড়ি, ডিঙ্গি, কাঁটা, চাঙ্গারি, চোঙ্গা, গঞ্জ, ডাগর, কয়লা, কুলা, খড়, খবর, খুকি, ন্যাকা, ধুতি, মেকি, ঢেঁক, গাড়, বোটকা, বাঁটি, টোড়া, খোকা, খুকি, ঢেউ, ঢোল, নেড়া, মই, যাঁতা, বাদুর, ডাঁসা, গাল, ছাই, কোল, কামড়, ঝিঙা, পয়লা, দর, ছুটি, ছড়ি, কচি, ঝাপসা, কলকে, চাটাই, ডাল, চিত, ঢাল, ঘোমটা, মটকা, বোঁচা, আড্ডা, বোঝা, দড়ি, দোয়েল, ফিঙে, কাতলা, চিংড়ি, বক, কুকুর, ঘুড়ি, চট ইত্যাদি।

৫. বিদেশি শব্দ : ধর্মপ্রচার, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্যে এ দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিদেশি জাতির আগমন ঘটেছে। তাদের সঙ্গে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়েশাদি, আত্মীয়করণের ফলে তাদের ভাষা হতে যে সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তা-ই বিদেশি শব্দ। যেমন–

ইংরেজি থেকে : অ্যাজমা, অফিস, অটো, অডিট, অ্যাডিট, অ্যাঙ্গেজম্যান ইত্যাদি।[৪]

আরবি থেকে : অসিলা, উজির, জওহর, তসরুপ, সজ্জাল ইত্যাদি।

ফারসি থেকে : আওয়াজ, উমেদার, কিনারা, খরগোশ, গর্দান, চাঁদা ইত্যাদি।

তুর্কি থেকে : কঞ্চি, কাঁচি, কোর্মা, চাকু, তমা, দাদা, নানা ইত্যাদি।

পর্তুগিজ থেকে : আনারস, আলকাতরা, কামরাঙা, চাবি ইত্যাদি।

ফরাসি থেকে : রেস্তোরাঁ, রেনেসাঁ, কুপন, বিস্কুট, বুর্জোয়া ইত্যাদি।

হিন্দি থেকে : আচানক, আচ্ছা, চানাচুর, চিজ ইত্যাদি।

গ্রিক ভাষা থেকে : সুরঙ্গ, কেন্দ্র, দাম ইত্যাদি।

চাইনিজ থেকে : এলাচি, চা, চিনি, লিচু ইত্যাদি।

জাপানিজ থেকে : রিকশা, সাম্পান, হারাকিনি, সুনামি, ইমোজি ইত্যাদি।

গুজরাটি থেকে : হরতাল ইত্যাদি

মায়ানমা থেকে : ফুঙ্গি, লুঙ্গি ইত্যাদি।

ওলন্দাজ থেকে : রুইতন, হরতন, টেক্কা, তুরুপ, ইস্ক্রুপ ইত্যাদি।

পাঞ্জাবি থেকে : চড্ডী, শিখ ইত্যাদি।

৬. মিশ্র শব্দ : এক বা একাধিক ভাষার দুটি শব্দ মিলিত হয়ে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকেই মিশ্র শব্দ বলে। যেমন–

কলিকলম	[বাংলা+আরবি]	মাস্টারমশাই	[ইংরেজি+বাংলা]
ধনদৌলত	[বাংলা+ফারসি]	বেটাইম	[উর্দু+ইংরেজি]
কাগজপত্র	[ফার্সি+বাংলা]	খ্রিষ্টাব্দ	[ইংরেজি+তৎসম]
হাটবাজার	[বাংলা+ফারসি]	রাজাবাদশা	[তৎসম+ফারসি]
হেডমৌলভি	[ইংরেজি+ফারসি]	বেশরম	[উর্দু+ফারসি]
ডাক্তারখানা	[ইংরেজি+ফারসি]	মেমসাহেব	[ইংরেজি+আরবি]
হাফহাতা	[ইংরেজি+বাংলা]	চৌহদ্দি	[ফারসি+আরবি]

৪. ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে, বাংলায় অভিধানভুক্ত মোট শব্দ প্রায় ১,৬০,০০০। ২৫% তৎসম, ৫% অর্ধ তৎসম, ৬০% তদ্ভব, ৮% বিদেশি ও ০২% দেশি শব্দ। ২০০টির অধিক মিশ্র শব্দ রয়েছে।

যুক্তবর্ণ পরিচিতি

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলা ভাষার সব কটি বর্ণমালার পরিচয় পেয়েছি। সাথে বর্ণমালার আকৃতি ও গঠিতরূপও জানতে পেরেছি। তবে ক্ক ক্ষ গ্ধ জ্ঞ জ্জ ক্ষ্য চ্ছ চ্ছ্ব এই অক্ষরগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। তাহলে কি আমাদের সব কটি বর্ণমালা পড়া হয়নি বা জানা হয়নি? উত্তর হলো–জানা হয়েছে; তবে আরেকটু গভীর করে জানলেই অজানা অক্ষরগুলো জানা হয়ে যাবে। প্রথমে জানতে হবে–এই অক্ষরগুলোর নাম কী? এগুলোর নাম যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর। একটি বর্ণ যখন অন্য কোনো বর্ণের সাথে যুক্ত হয়, সে বর্ণকে যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর বলে।

বাক্যের মধ্যে কখনো বর্ণ তার আসল আকৃতিতেই ব্যবহার হয়। যেমন : যখন, তখন, কলম, বরণ, কল, জল, পণ, ফল, আকর ইত্যাদি। বর্ণিত শব্দগুলোতে সব কটি বর্ণ তার আসল আকৃতিতে রয়েছে। এজন্য এগুলো চিনতে কারও কোনো সমস্যা হয় না। তবে কখনো কখনো বাক্যে এমন আকৃতিতে বর্ণমালার ব্যবহার পাওয়া যায়, যা চিনতে বুঝতে অনেকেরই সমস্যা হয়। যেমন : দ্বন্দ্ব, দৌগ্ধী, লক্ষ্মী, ইক্ষ্বাকু, অন্তঃস্থ, উজ্জ্বল, রাষ্ট্র, ঝঞ্ঝাট, বজ্র, দ্বিত্ব ইত্যাদি।

কোন বর্ণ কোন বর্ণের সাথে যুক্ত হতে পারে? স্বরবর্ণ কখনো অন্য কোনো স্বরবর্ণের সাথে যুক্ত হয় না। ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হতে পারে। যদি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যুক্ত হয়, তাহলে আমাদের চিনতে তেমন অসুবিধা হয় না। যেমন : কাল (ক+আ=কা), বিধি (ব+ই=বি), দুধ (দ+উ=দু), মৃত (ম+ঋ=মৃ) ইত্যাদি। এখানে ক-য়ের সাথে 'আ' যুক্ত হয়েছে, ব-য়ের সাথে 'ই' যুক্ত হয়েছে, ম-য়ের সাথে 'ঋ' যুক্ত হয়েছে; এগুলো সহজেই ধরা যায়। কেননা, স্বরবর্ণের কোনো অক্ষর মিলিত হলে ব্যঞ্জনবর্ণে কোন ধরনের আ-কার, ও-কার, হ্রস্ব-কার যুক্ত হয় এটি আমাদের মুখস্থ এবং জানা। এ কারণে ব্যঞ্জনবর্ণ + স্বরবর্ণ যুক্ত হলে বুঝতে অসুবিধা হয় না; আর স্বরবর্ণের কোন বর্ণ কোন ধরনের আকৃতিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয়–আসুন দেখি। যদিও সবার জানা তারপরও আবার দেখি ও পড়ি।

মূর্ধন্য ষ-এর বিধান[৭৩]

বাংলাভাষায় শিস্ ধ্বনি বর্ণ তিনটি। দন্ত্য স, মূর্ধন্য ষ ও তালব্য শ। উচ্চারণে একই হওয়ায় বানানে প্যাঁচ লাগে। যেমন : বিশ, বিষ, বিস;[৭৪] এই তিনটি শব্দের উচ্চারণ একই। বানানে বেশকম, অর্থেও। সুতরাং এই গণ্ডগোল নিরসনে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। যদি মনোযোগী না হই, তখন যে গণ্ডগোল বাঁধবে, তার থেকে উত্তরণ বড় কঠিন। ধরুন, আপনার স্ত্রী বলল, বাজার থেকে বিস নিয়ে আসেন। আপনি বিষ নিয়ে এলেন। তখন উপায় কী হবে? সুতরাং চলুন ষত্ব বিধান জানি।

০১. তৎসম শব্দে রেফ, ঋ ও ঋ-কারের পর অধিকাংশই মূর্ধন্য ষ বসে। যেমন–

রেফ-এর পরে : আকর্ষণ, অভিকর্ষ, আকর্ষী, উৎকর্ষ, ঘর্ষণ, বিমর্ষ, শীর্ষ, ঈর্ষা, ধর্ষণ, বর্ষ, বর্ষণ, বর্ষীয়ান, বার্ষিকী, পর্ষদ, হর্ষ, সংঘর্ষ, মহর্ষি[৭৫] ইত্যাদি।

ঋ-এর পরে : ঋষি, ঋষভ, ঋষিতা, ঋষিতুল্য ইত্যাদি।

ঋ-কারের পরে : বৃষ, তৃষা, তৃষ্ণা, কৃষাণ, কৃষক, কৃষ্ণ, দৃষ্টি[৭৬] ইত্যাদি।

০২. ট ও ঠ বর্ণের সাথে শিস্ ধ্বনি যুক্ত হলে সর্বদা মূর্ধন্য ষ হবে। শর্ত হলো, শব্দটি তৎসম হতে হবে। যেমন–

ট-এর সাথে : অনিষ্ট, অভীষ্ট, আকৃষ্ট, আদিষ্ট, আবিষ্ট, ইষ্টক, ইষ্টি ইত্যাদি।

ঠ-এর সাথে : অতিষ্ঠ, অধিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, ওষ্ঠ, ওষ্ঠাধর, কাষ্ঠ, কুষ্ঠ ইত্যাদি।

০৩. অধিকাংশ সময় 'ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ' এবং এগুলোর কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়।[৭৭] শর্ত হলো, শব্দটি তৎসম হতে হবে। যেমন–

ই/ি	ঈ/ী	উ/ু	ঊ/ূ	এ/ে	ঐ/ৈ	ও/ো	ঔ/ৌ

[৭৩] বিভিন্ন বইয়ে এই বিষয়ের শিরোনাম দেওয়া আছে 'ষত্ব বিধান'। কোথায় কখন মূর্ধন্য ষ বসবে; সেসব জানার নাম 'ষত্ব বিধান'।

[৭৪] শব্দ তিনটের অর্থ (যথাক্রম) : সংখ্যা বিশেষ, গরল যে পদার্থ পানে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে, পদ্মের ডাঁটা শাক-সবজির মূলকাণ্ড।

[৭৫] ব্যতিক্রম : অর্শ আদর্শ দর্শন দর্শী নিদর্শন পরামর্শ পারদর্শিতা পার্শ্ব পার্শ্বিক বহুদর্শী বর্শা সন্দর্শনস্পর্শ ইত্যাদি।

[৭৬] কৃশ ঋাতু দ্বারা গঠিত শব্দগুলো এর ব্যতিক্রম। যেমন: কৃশতা কৃশকায় কৃশাঙ্গ কৃশানু কৃশোদর ইত্যাদি।

[৭৭] ব্যতিক্রম : দিশা দেশ বিশ বিসদৃশস বিসংবাদ।

প্রতিবর্ণের নানারূপ

একদা বাজার থেকে কোনো ইসলামী বই কিনলে, তাতে বানানের হরেক রকম রূপ দেখা যেতো। যেমন : অযু অজু ওযু ওজু, নামাজ/ নামায, যাকাত/ জাকাত, রোজা/ রোযা। একই বানান বিভিন্নভাবে লেখা হচ্ছে। তাই, একটিকে শুদ্ধ অন্যটিকে ভুল বলে কেটে দিতে পারবেন না। তারপরও বানানে সমতাবিধান জরুরি। যাতে সকলেই সবখানে একই শব্দ একই বানানে একই বর্ণে লেখতে পারে। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই ভিন্ন ভাষার শব্দের উপস্থিতি থাকে। এটা ভাষার দুর্বলতা বা অপ্রতুলতা নয়। বরং বলা যায় ভাষার উদাহরতা। সবচে' সমৃদ্ধ ভাষা আরবি। সেই ভাষায় লেখা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিম। তাতেও রয়েছে ভিন্নভাষার শব্দাবলি[৯১]। একারণে প্রতিবর্ণ বিষয়টি আয়ত্তে থাকা জরুরি।

ইংরেজি বর্ণমালার বাংলা প্রতিবর্ণ

A	অ আ এ অ্যা	B	ব	C	ক স চ
D	ড দ	E	এ ই ঈ	F	ফ
G	গ জ	H	হ	I	ই ঈ আই
J	জ য	K	ক	L	ল
M	ম	N	ন	O	ও অ আ উ
P	প	Q	ক	R	র
S	স ছ জ	T	ট ত	U	উ আ ইউ
V	ভ	W	ওয় উ ওয়া	X	এক্স ক্স
Y	য় অ আই ই	Z	জ য		

বাংলা বর্ণমালার ইংরেজি প্রতিবর্ণ

বাংলা	প্রতিবণ	উদাহরণ	
অ	A	অতুল/ অবনি	Atul/ Abani
আ	A	আকাঙ্ক্ষা/ আভা	Akanksha/ Abha

[৯১] তাফসিরকারকেরা এমনই বলেছেন

যতি-চিহ্ন বা বিরাম-চিহ্ন

কথাকে লিখিতরূপ দেওয়ার সময় এই প্রশ্ন বিস্ময় থামা এবং স্বরের ওঠানামা নির্দেশের জন্য সাধারণত যে চিহ্নের ব্যবহার হয়; তাকেই **যতি-চিহ্ন**। এগুলো বিরাম-চিহ্ন, বিরতি-চিহ্ন **বা ছেদ চিহ্ন** নামেও পরিচিত।
বর্তমানে বাংলা ভাষায় ব্যবহার হওয়া চিহ্নের একটি চিত্র দেওয়া হল নামসহ।

ক্রমিক নং	চিহ্ন	চিহ্নের নাম	মন্তব্য
০১	।	দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	এক সেকেন্ড
০২	,	কমা বা পাদচ্ছেদ	১ বলতে যত সময় প্রয়োজন তত তক্ষ থামবে
০৩	-	হাইফেন	থামার প্রয়োজন নেই
০৪	:	কোলন	এক সেকেন্ড
০৫	?	প্রশ্নবোধক	এক সেকেন্ড
০৬	’	ঊর্ধকমা [ইলেক বা লোপ চিহ্ন]	থামার প্রয়োজন নেই
০৭	‘ ’/ “ ”	এক/ দুই উদ্ধৃতি চিহ্ন [যুগল উদ্ধৃতি চিহ্ন]	১ বলতে যত সময় প্রয়োজন তত তক্ষ থামবে
০৮	( )	বন্ধনী বা ফার্স্ট ব্যাকেট	থামার প্রয়োজন নেই
০৯	{ }/ [ ]	দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্ধনী	থামার প্রয়োজন নেই
১০	...	ত্রিবিন্দু [বর্জন চিহ্ন]	থামার প্রয়োজন নেই
১১	/	বিকল্প চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
১২	;	সেমিকোলন	১ বলার দ্বিগুণ সময়
১৩	—	ড্যাশ	এক সেকেন্ড
১৪	:—	কোলনড্যাশ	এক সেকেন্ড
১৫	!	বিস্ময়চিহ্ন	এক সেকেন্ড
১৬	.	সংক্ষেপণ চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
১৭	√	ধাতু দ্যোতক চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
১৮	=	সমান চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই

সমার্থক শব্দের অভিধান

অনুগ্রহ : অনুবল, অনুপ, অনুকোশ, আনুকূল্য, আনৃশংস্য, আশীর্বাদ,
অত্যাচার : উৎপাত, উৎপীড়ন, কহর, ক্রেশ দেওয়া, ঘাঁটানো, দলন, নিগ্রহ,
আকার : অবয়ব, আকৃতি, আদল, অধিরূপ, অক্ষর, আড়া, আদরা, আদলা,
অবিশ্বাস : অনাস্থা, অপ্রতীতি, অপ্রত্যয়, অভরসা, অভিশঙ্কা, অপবাদ, কুণ্ঠা,
অবসর : অবকাশ, অখণ্ড, অক্রিয়া, কর্মমুক্তি, ছুটি, জিরান, জিরেন, নৈঙ্কর্ম্য,
অবহেলা : অনবধানতা, অনতিযত্ন, অননুরাগ, অবহেলন, অবজ্ঞা, অনাদর,
অভাব : অনটন, অনাটন, অপর্যাপ্ততা, অপ্রতুল, অপ্রাচুর্য, রিক্ততা, অর্থকৃচ্ছ,
অভিযোগ : অনুযোগ, অনুযোজন, অভিশংসন, আপত্তি, আবেদন, আরজ,
আগুন : অগ্নি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অর্চি, অনল, অসিতার্চি, আগ, ফুলকি, ঈষির,
ইঙ্গিত : সঙ্কেত, আক, আলামত, উপলক্ষণ, প্রতীক, সিগনাল, সুলক্ষণ,
ইচ্ছা : অনুরাগ, অভিলাষ, অভিপ্রায়, অভীপ্সা, আগ্রহ, অন্বেষা, আকুলতা,
ঈর্ষা : অর্ন্তদাহ, অসূয়া, আখজ, আক্রোশ, ঘৃণা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, নিহিংসন,
উপদেশ : অসিয়ত, আমর্শ, আজ্ঞা, ইতিহ, নির্দেশ, উপদেশ, পরামর্শ,
ওপর : ঊর্ধ্ব, চুড়া, অগ্র, আগা, ছাদ, মাচান, শীর্ষ, মগডাল, শিয়র,
উলটো : উপুড়, বৈপরীত্য, প্রতিলোম, উজানি,
উড়া : উড্ডয়ন, উড়ন, উৎপতন, উড়ন্ত, নভশ্চারণা,
উক্তি : আখ্যা, আলাপ, উচ্চাবাচ্য, কথন, বিগদ, বচন, বক্তৃতা, বাক্য,
ঋজুতা : অবক্রতা, আর্জব, আড়ভাঙা, সলতা,
একতা : অখণ্ডতা, অভেদ, অভিন্নতা, আঁতাত, ইত্তেহাদ, এককাট্টা, ঐক্য,
কুকথা : অকথ্য, অপভাষ, অপভাষণ, অশ্লীল কথা, কুবাদ, কুবাক্য, দুর্বচন,
ক্ষিপতা : অচিরতা, গতিশীলতা, চঞ্চলতা, ঝট, তৎপরতা ব্যগ্রতা, শীঘ্রতা,
কাজ : কম্ম, কর্ম, কর্তব্য, কার্য, কৃতকর্ম, ক্রিয়া, চাকরি,
কাটা : উৎকর্তন, কর্তন, কপচানো, কাটন, খণ্ডন, ছেঁড়া, ছেঁটে, বৃন্তন,
কান্না : অশ্রুপাত, আর্তনাদ, কাঁদন, কাঁদা, ক্রন্দন, রোদন, বিলাপ,
কথোপকথন : অনুলাপ, অভিলাপ, আলাপ, আলাপন, কথাবার্তা, সংলাপ,
খাওয়া : অদন, অভ্যবহরণ, অশন, আহার, খাদন, গ্রাস, ভক্ষণ, গরোস,
গাছ : অটবি, উদ্ভিদ, গুল্ম, তরু, মহীরুহ, বৃক্ষ
ঘুম : তন্দ্রা, নিদ, নিদ্রা, বিশ্রাম, প্রমীলা, শয়ন, .

সমোচ্চারিত শব্দের অভিধান

ড. মুহম্মদ এনামুল হক এর মতে, উচ্চারণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, শব্দগুলো ঠিক একরূপ নয়, কিছুটা পৃথক কিন্তু বাংলাভাষীদের মুখে অনেক সময় একই রকম উচ্চারিত হয়। এই ধরনের শব্দগুলোর মধ্যে অনেকগুলোরই মূল উচ্চারণ ছিল ভিন্ন। কিন্তু কালপ্রবাহে ভিন্নতা দূর হয়ে উচ্চারণগত ব্যবধান কমে গিয়ে বর্তমানে উচ্চারণের ক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে গেছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, দুই বা তাহারও বেশি শব্দ, বানানে ও অর্থে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণে একরূপ হইলে, সেগুলোকে বলা হয় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ। বানান ও অর্থ ভিন্ন হলেও বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দ রয়েছে। যেগুলোর উচ্চারণ প্রায় একই রকম যেমন- অর্ঘ-মূল্য, অর্ঘ্য-পূজার উপকরণ, অবদান-সৎকর্ম, অবধান-মনোযোগ। বাংলা ভাষার শব্দ বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এসব শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভাষার শব্দ সম্ভার বৃদ্ধি পায়। নিম্নে প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো :

অংশ- ভাগ		ওষধি- একবার ফল দিয়ে
অংস- স্কন্ধ	বিমর্ষ- বিষণ্ন দুঃখিত	যে মরে যায়
	বিমর্শ - বিশেষ বিবেচনা	ঔষধি- ভেষজ উদ্ভিদ
অনিল- বাতাস		
অনীল- যা নীল নয়	বিত্ত- ধন	উৎপত- পাখি
	বৃত্ত- গোলক	উৎপথ- কুপথ
অন্ন- খাদ্য	বৃত্য বরেণ্য	
অন্য- অপর		উদ্ধত- অবিনীত
	বান- বন্যা	উদ্যত- প্রবৃত্ত
অন্ত- শেষ	ভান- দীপ্তি/ শোভা	
অন্ত্য- অন্তিম/ নীচ জাতি	ভাণ- ছল	উপাদান- উপকরণ
		উপাধান- বালিশ
অন্নদা- অন্নদাত্রী	ভারা- উচ্চস্থানে কাজ	
অন্যদা- অন্যদিন	করার মাচা	ইতি- শেষ/ অবসান
	ভারা- মাশুল	ঈতি- ছয় প্রকার
অধীতি- অধ্যয়ন		
অধীতী- অধ্যয়নকারী	ভাষ- কথা	ঈশ- ঈশ্বর
	ভাস- দীপ্তি	ঈষ- লাঙ্গলের দণ্ড